"উপসংহার"

"জীবনভাবনা থেকে জীবনদর্শন"

১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের ৭০ তম জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপনের সময় প্রকাশিত 'The Golden Book of Tagore' স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনা করতে গিয়ে সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মূল্যবান 'মুখবন্ধে' রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কবি প্রতিভার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে 'Poet-Seer' ব'লেছেন এবং এই কথাটা মনে রেখে বলেছেন -

> "Rabindranath Tagore is our greatest Poet and Prose-writer. Son of a Maharshi ("a great Seer"), and himself a seer and sage, he belongs to a family the most gifted in Bengal in the relams of religion, Philosophy, literature, music, Painting, histrionic art. There is no department of Bengali literature that he has not touched which he has not adorned, elevated, and filled with inspiration and lighted up by the lesture of his genius. Difficult as if undoubtedly would be to give an exhaustive list of his multifarious achievements from early youth upwards for he is a many sided and towering personality, even the departments of literature and knowledge which he has touched and adorned would make a pretty long time." (Forward. p. iii)

প্রকৃতপক্ষে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য নানাদিক থেকে মূল্যবান। তিনি বলতে চান রবীন্দ্রনাথ মূলত 'Poet-seer', অর্থাৎ যিনি কবি হিসেবে এই পার্থিব জীবন ও বিশ্ব জীবনকে দেখে গেছেন নিরন্তর, সমস্ত জীবন ধরে। এই দেখার ভিতর থেকে তিনি অর্জন করেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা, এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে মানুষ, বিশ্ব প্রকৃতি এবং অদৃশ্য অধ্যাত্ম জগৎ। এই অভিজ্ঞতাগুলি আসলে দুটি জগৎকে কেন্দ্র ক'রে - সীমার জগৎ ও অসীমের জগৎ। সীমার জগৎ বলতে বোঝায় যে জগৎ আমরা নিরন্তর দেখি অর্থাৎ মানুষের জীবন ও বিশ্ব প্রকৃতি, যা আমাদের সামনে সতত মেলে ধরে রেখেছে প্রকৃতি। অন্যদিকে আছে অসীম বা অরূপের জগৎ, যা অনুভবগম্য কিন্তু যা চোখে দেখা যায় না, যে কথাটা 'রাজা' নাটকের অন্বিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ এই দুটি জগৎকেই দেখেছেন সমস্ত জীবন ধরে, একদিকে তিনি যেমন আমাদের মর্ত্যজীবনের রূপরস সমস্ত হৃদয় দিয়ে পান করেছেন, অন্যদিকে তেমনি অরূপের অনির্বচনীয় অনুভবে নিমগ্ন হয়েছেন প্রগাঢ়ভাবে। এইভাবেই তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন 'Poet-seer' যেমন তাঁকে অভিহিত করেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

এই যে দেখা, সেই দেখা থেকেই কবির মনের মধ্যে উদিত হয়েছে নানান ভাবনা - জীবনের বিচিত্র দিক সম্পর্কে বিচিত্র ভাবনা। এই ভাবনার মধ্যে স্থান পেয়েছে মানুষের জীবনের নানা দিক - যেমন প্রেম, মৃত্যু, পাপ ও অমঙ্গলবোধ, ইত্যাদি। তেমনি স্থান পেয়েছে প্রকৃতি, অরূপানুভূতি। বলা বাহুল্য, এই গুলির প্রত্যেকটি তার আপন মহিমায় মানবজীবনে স্থান পায়। এইসব দিকের নিজস্ব এক একটি রূপ আছে। অর্থাৎ এগুলি তার আপন স্বরূপে বিশিষ্ট। অন্যদিকে আবার, যেহেতু তারা জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে, তাই তারা অভিন্নও বটে। অর্থাৎ তারা স্বতন্ত্র হয়েও একসঙ্গে জীবনের মধ্যে পাশাপাশি বাসা বেঁধে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তি জীবনে এইভাবেই এইসব দিক প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ভিতর থেকে প্রত্যেক দিক সম্পর্কে তাঁর মনের মধ্যে এক একটি ভাবনা জেগে উঠেছে। বস্তুত, রবীন্দ্রকাব্যে তথা রবীন্দ্রসাহিত্যে এইসব ভাবনাগুলি নানা রূপে নানা ভাবে নানা স্তরে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের পাঠক হিসেবে আমাদের আগ্রহ ছিল এইসব জীবনভাবনা কীভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপায়িত হয়েছে এবং অবশেষে তাদের পরিণতি ঘটেছে কীভাবে, সর্বোপরি, তার পরিণতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত কোন্ জীবনসত্যে পৌঁছেছেন।

"উপসংহারে" পৌঁছে এখন আমরা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হ'য়ে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করবো। এবং সেই সূত্রে, আর একবার আমরা পিছনের অধ্যায়গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাই।

বস্তুত, বর্তমান গবেষণার আলোচ্য বিষয় ও শিরোনাম 'রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা'। এই গবেষণার ভূমিকা তথা 'প্রস্তাবনায়' একদিকে যেমন এর আলোচ্য বিষয়ের রূপরেখাটি তুলে ধরা হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি এই গবেষণা-কর্মের *thesis* অর্থাৎ উপজীব্য ও বক্তব্য সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছিল। এই গবেষণার যে আলোচ্য বিষয় তা ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনার বিচিত্র দিকের পর্যালোচনা, সেগুলি যথাক্রমে :-

প্রথম অধ্যায় : প্রকৃতি
দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রেম
তৃতীয় অধ্যায় : সৌন্দর্য
চতুর্থ অধ্যায় : মর্তপ্রীতি
পঞ্চম অধ্যায় : অরূপানুভূতি
ষষ্ঠ অধ্যায় : পাপ ও অমঙ্গলবোধ
সপ্তম অধ্যায় : মৃত্যু

আমরা বলতে চেয়েছিলাম প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবন ভাবনার এই দিকগুলিই মুখ্য উপাদান। আমাদের লক্ষ্য ছিল কিভাবে এই দিকগুলি বিশেষভাবে তাঁর কাব্যে এবং অন্যান্য রচনায় রূপায়িত হয়েছে অর্থাৎ জীবনের এই দিকগুলি সম্বন্ধে - কিভাবে তিনি ভেবেছেন। যদিও আমরা মূলত কাব্যকে কেন্দ্র করে জীবনভাবনার স্বরূপটি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি তথাপি প্রয়োজনবোধে তাঁর গান, নাটক ও অন্যান্য রচনা থেকেও উপাদান গ্রহণ করেছি। বস্তুত এই বিষয়টির অনুকূলে রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্ররচনা থেকে যথোচিত তথ্য সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছি।

একজন মানুষ তার সমগ্র জীবনে অনেক কিছু দেখেন, অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শৈশব থেকে সুরু করে যৌবনে, যৌবন থেকে অবশেষে বার্ধক্যে পৌঁছোবার বিভিন্ন পর্বে জীবন সম্পর্কে তার নানান ভাবনা, নানান ধারণা গড়ে ওঠে। এবং এইসব নানান বিচিত্র ভাবনার সমাহারে শেষ পর্যন্ত তিনি গড়ে তোলেন একটি জীবনসত্য। এই জীবন-সত্য প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষের জীবনের সার্বভৌম উপলব্ধি। এই সার্বভৌম উপলব্ধিই একজন মানুষের জীবনের সত্যরূপ।

রবীন্দ্রনাথও, শুধু কবি হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবেই মানবজীবনের বিচিত্র রূপ দেখেছেন, বহু বিচিত্র ঘটনার ভিতর থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এবং এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাহারেই তাঁর জীবনভাবনা গড়ে উঠেছে।

বলাবাহুল্য, মানুষ তার সব অভিজ্ঞতা একসঙ্গে লাভ করে না। জীবনের সব পর্বের অভিজ্ঞতাও এক হয় না। জীবনের মৌলিক ধ্যান ধারণা ও বিভিন্ন দিক একই সঙ্গে পরিপুষ্ট হয় না। প্রত্যেক মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতা সূত্রেই এক একটি ধারণায় উপনীত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও তাই দেখি। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বহু বিচিত্র

ঘটনার ভিতর থেকে জীবনের বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে একইভাবে তাঁর জীবনভাবনাগুলি গড়ে তুলেছেন। এবং যেহেতু তিনি বাক্-শিল্পী, তাই তাঁর পক্ষে সেইসব ভাবনাকে বাঙ্ময় রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

বস্তুত, রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চার মূল কথা হল - রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার স্বরূপ জানা। সেই জীবন ভাবনা একটি মাত্র বিন্দুতে দাঁড়িয়ে নেই, তা জড়িয়ে আছে তাঁর সমগ্র জীবনের প্রসঙ্গে, তা মিশে আছে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে। রবীন্দ্র নাথ কীভাবে জীবনকে দেখেছেন, জীবনের মৌলিক আবেগ ও ধারণাগুলি ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন, এবং কীভাবে তার ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনভাবনা গড়ে উঠেছে, প্রকৃতপক্ষে সেই কাজই বর্তমান গবেষণার একমাত্র লক্ষ্য।

বলা বাহুল্য, এক কথায় বিচিত্র জীবনের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। পাপে-পুণ্যে, সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, আলো-অন্ধকারে যে মানুষের জীবন গড়া, সেই মানুষের জীবনের পরিচয় দেওয়া সহজসাধ্য নয়। সর্বোপরি, মানুষ তার মনের গহন অন্তরালে রহস্যময়। তার পরিচয় দেওয়া আরো কঠিন কাজ। মানুষের জীবন সমুদ্র তরঙ্গের মতো অবিরত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। সেই চলার পথে যে ঘটনাপুঞ্জ জমা হয় একজন মানুষের জীবনে। তার মধ্যে সঞ্চিত থাকে তার সুখ পরিচয়। তারই মধ্যে নিহিত থাকে তার জীবনভাবনা। এবং এই কারণেই, মানুষের জীবন ভাবনার নাগাল না পেলে একজন মানুষের যথার্থ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথেরও সম্যক পরিচয় পেতে গেলে তাঁর জীবনভাবনার পরিচয় জানতে হবে। এক্ষেত্রে, তাঁর জীবনভাবনার দুটি উপাদান - একদিকে তাঁর জীবনের বিচিত্র

ঘটনাপুঞ্জ, যা তাঁর সৃষ্টির প্রেক্ষাপট। অন্যদিকে তাঁর সৃষ্টির অভিজ্ঞান। বর্তমান গবেষনায় তাই আমরা যদিও তাঁর সাহিত্যের উপরেই নির্ভর করবো তাঁর জীবনভাবনার স্বরূপটি বোঝবার জন্যে, তেমনি তাঁর পাশাপাশি, কীভাবে সেইসব ভাবনা বা সৃষ্টি তাঁর জীবন থেকে উঠে এসেছে, তাও আমাদের আলোচনার লক্ষ্য ছিল।

এই যে জীবনভাবনার কথা বলছি তার মৌল উপাদান জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি। কবি হিসেবে তিনি যে বিচিত্র জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সেই অভিজ্ঞতাগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে একেকটি ভাবনার রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে এইসব জীবনভাবনার প্রত্যেকটির স্বতন্ত্ররূপ আছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে আমরা বলতে পারি সেইসব জীবনভাবনা সমবেত ভাবে একটি জীবনদর্শন গড়ে তুলেছে। জীবনদর্শন কথাটি একটি দার্শনিক প্রত্যয় যা দর্শনের আলোচ্য বিষয়। জীবনদর্শন শব্দটি অবশ্য বহু ব্যবহৃত। এবং সেই কারণেই হয়তো শব্দটি তার জৌলুষ হারিয়েছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

১. সকলেই দার্শনিক নন, কিন্তু সকলেরই নিজের নিজের একটা চিন্তার জগৎ আছে, মতামত বা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভূমি আছে। কবি কবিতা লেখেন, নাট্যকার নাটক রচনা করেন, চিত্রকর ছবি আঁকেন, চিন্তাশীল মানুষ চিন্তা করেন, এঁরা দার্শনিক হোন আর না-ই হোন, এঁদের সকলেরই একটা করে দাঁড়াবার জমি আছে, একটা করে বিশ্বাসের ঘর আছে। শুধু অসাধারণদের নয়, সাধারণ মানুষেরও তাই - তাঁরাও চিন্তা করেন, আলোচনা করেন, তর্ক করেন, অথবা কেউ হয়তো নিঃশব্দেই জীবন-যাপন করেন। কিন্তু সব সময়ই তাঁদের পা থাকে

---

১. রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ / সত্যেন্দ্রনাথ রায় / গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ কলকাতা / প্রঃ প্রকাশ ২২শে শ্রাবণ ১৩৮৭ / প্রথম অধ্যায় প্রস্তাবনা / ১.সূচনা / পৃ.সংখ্যা ৫

নিজের নিজের বিশ্বাসের জমিতে। এই যে নিজস্ব যতামতের, নিজস্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এলাকা, এইখানে দাঁড়িয়েই আমরা জগৎ ও জীবনকে দেখি, যাচাই করি, বুঝে নিই। এইটেই আমাদের নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ। গম্ভীর ভাষায় একেই বলা হয় জীবনবোধ, বলা হয় জীবনদর্শন"।

২. " ... কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ পেশাদার দার্শনিক নন, যেহেতু প্রধানত তিনি কবি, যেহেতু তাঁর তত্ত্বমূলক রচনাও রূপময় বিগ্রহ, সেই হেতু অনেকেই তাঁকে দার্শনিক বলে স্বীকার করেন না।"

৩. " কিন্তু ব্যবহৃত হয়ে হয়ে আজকাল জীবনদর্শন কথাটা অনেকখানি যেন জীর্ণ হয়ে এসেছে। ওর মধ্যে দর্শন শব্দটা আছে বলেই বোধকরি কথাটাতে একটা শীতল তাত্ত্বিকতার ইঙ্গিত, একটা কেতাবী ভাবানুসঙ্গ এসে গিয়েছে। জীবনদর্শন বললে মনে হয়, এর মধ্যে বুঝি অস্পষ্ট, অস্ফুট কিছু নেই, এর মধ্যে বুঝি বিশুদ্ধ মনন ছাড়া আর কোনো কিছুর স্থান নেই। এর মধ্যে বুঝি আশা-আকাঙ্খার, কি কল্পনার, কি স্বপ্নের, কোনো ভূমিকা নেই। বিশ্বাসের জগৎ বললে ঠিক সেরকম মনে হয় না। বিশ্বাসের জগৎ মুখ্যত মননের জগৎ বটে, কিন্তু সেখানে উপলব্ধি অনুভব ইচ্ছাপূরণ অভ্যাস সংস্কার কল্পনা স্বপ্নচেতনা অবচেতনা সবেরই অল্পবিস্তর ভূমিকা আছে - আলাদা ভাবে নয়, চিন্তার জীবন্ত সমগ্রতার মধ্যে।

---

২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬.

৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭.

এই কারণেই বইয়ের নামকরণে বিশ্বাসের জগৎ কথাটাকে আমরা বেছে নিলাম। কিন্তু জীবনদর্শন কথাটাকেও আমরা পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। বর্তমান প্রবন্ধে জীবনদর্শন কথাটিকে আমরা সংশোধিত ভাবানুসঙ্গে বিশ্বাসের জগৎ অর্থেই ব্যবহার করতে চাই। অর্থাৎ বর্তমান আলোচনার সমার্থে দুটি কথাই আমরা ব্যবহার করব, যখন যেটি সুবিধাজনক বলে মনে হবে।"

মূলতঃ অধ্যাপক রায়ের দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করে একই কারণে আমরা জীবনদর্শনের প্রায় অনুরূপ বা সমর্থক জীবনভাবনা শব্দটি ব্যবহার করেছি।

আমরা সেই দার্শনিক ব্যাখ্যার বিশদ-বিশ্লেষণে না গিয়েও সাধারণ ভাবে বলতে পারি যে জীবনদর্শন বা জীবনভাবনা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে জীবন সম্পর্কে একটি স্থির প্রজ্ঞা। যে কোন মহৎ কবি বা শিল্পীর মধ্যে আমরা একটি জীবনদর্শনের পরিচয় পেয়ে থাকি। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে যে কোন মহৎ কবি বা শিল্পী একটি বিশিষ্ট জীবন দর্শনের অধিকারী হয়ে থাকেন। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অর্থাৎ তারও একটি বিশিষ্ট জীবন-দর্শন আছে। পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলিতে আমরা একথাটিই বলতে চেয়েছিলাম যে একটি বিশেষ কালে ও সময়ে জন্মলাভ করে রবীন্দ্রনাথ জীবন সম্পর্কে যে ধারণা বা ভাবনায় উপনীত হয়েছেন তা গড়ে উঠেছে তাঁর সমস্ত জীবন ব্যাপী অভিজ্ঞতার সূত্রে। অর্থাৎ টুকরো টুকরো ভাবে জীবনের বিভিন্ন ভাবনা ও ধারণাগুলি নীহারিকার মতো ভাসতে ভাসতে অবশেষে একটি জীবনসত্যে উপনীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জীবনদর্শন জীবনসত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং হয়তো একথা বলতে পারি যে জীবনভাবনাই হচ্ছে জীবনদর্শণের সোপান। তাহলে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার মুখ্য দিকগুলির আলোচনার শেষে আমাদের পরবর্তী দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর জীবনদর্শনের প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করে দেখানো।

~~বাস্তবিকপক্ষে, যে সব বিশিষ্ট সমালোচক রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের এই জীবনদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন।~~

বাস্তবিকপক্ষে, যে সব বিশিষ্ট সমালোচক রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের এই জীবনদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সকলেই যে একই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা দেখেছেন তা নয় কিন্তু মূলত তাঁরা বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনের অস্তিত্ব আছে যার উপর দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। এই জীবনদর্শনের ব্যাপারটি তাঁরা তাত্ত্বিক-দিক থেকে বিবেচনা করে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। এ বিষয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক অভিমত উল্লেখ করা গেল।

প্রথমেই অজিত চক্রবর্তীর কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি সম্ভবত প্রথম রবীন্দ্র-সমালোচক। যিনি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একটি দার্শনিক তত্ত্বের অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে একটি আধ্যাত্মিকবোধ সততঃ কাজ করে গেছে। অজিত চক্রবর্তীর মতে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের সেটিই মূল কথা। অজিত চক্রবর্তী বলছেন -

৬. "সাহিত্য-সমালোচনা বলিতে আমাদের দেশের প্রাকৃত জনের সংস্কার এইরূপ যে, রচনামাত্রকে ভালো এবং মন্দ এই দুইটা মোটা ভাগে বিভক্ত করিয়া বাটখারার দুই পাল্লায় চাপাইয়া তৌল করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তির সাহিত্যকে এমন খণ্ড ভাবে দেখাকে আমি সত্য দেখা বলিয়া মনে করতে পারি না। বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে, সেই সূত্র তাহার পূর্বকে উত্তরের সঙ্গে গাঁথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়। অপূর্ণতা - অস্ফুটতা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা

---

৬. রবীন্দ্রনাথ / অজিতকুমার চক্রবর্তী / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / আশ্বিন ১৩৫৩ / নিবেদন

সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় - সেই জন্য কবির বা সাহিত্যিকের রচনার মন্দ মানে অপরিণামের মন্দ এবং ভালো মানে পরিণতির ভালো। কবির বা সাহিত্যিকের সেই পরিণতির আদর্শের মানদণ্ডেই তাঁহার রচনার ভালোমন্দকে যাচিতে হইবে, তা বই ভালো এবং মন্দকে প্রত্যেকের আপন আপন সংস্কারানুসারে দুই টুকরো করিয়া নিক্তির মাপে ওজন করিলে চলিবে না।

কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে তাঁহার এই ভিতরকার পরিণতির আদর্শের সূত্রটিকেই আমি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

৭. আমি তো মনে করি কবির কাব্যরচনা ও জীবন রচনা একই রচনার অন্তর্গত, জীবনটাই কাব্যে আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সেইজন্য জীবনের ভিতর হইতে কাব্যকে যদি দেখি, অথবা কাব্যের ভিতর হইতে যদি জীবনকে দেখি, তাহাতে কবিতার ব্যক্তিগত দিকটার উপরেই বেশি ঝোঁক দেওয়া হইবে না। কারণ কবিতা জিনিষটাই ব্যক্তিগত নহে, এবং কবির যথার্থ জীবনও তাঁহার আপনার একলার জিনিষ নহে। তিনি যেন সচ্ছিদ্র বংশখণ্ডের মতো, অন্য জিনিসে যে ছিদ্র কাজের পক্ষে ব্যাঘাতকর হয়, বংশখণ্ডে সেই ছিদ্রই বিশ্বসংগীত প্রচার করিয়া থাকে।

সেইজন্য আমি যখন বলিলাম যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনা কোনো বাহিরের সংস্কারকে অবলম্বন করে নাই, তাহা তাঁহার সমস্ত জীবনের ভিতর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তখন একথা বুঝিতে হইবে যে, জীবনের সকল বিচিত্রতাকে পরিপূর্ণ একের মধ্যে পাইবার আকাঙ্খাই কবির পরিণত জীবনে কাজ করিতেছে। সুতরাং এই পরিণতিকে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে পড়িতে হইবে, নানা তানকে সমের মধ্যে মিলাইয়া পূর্ণ রাগিনীর সমগ্র রূপটিকে দেখিতে হইবে।"

---

৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬-১৭

৮. "আমি নিঃসংকোচে বলিতে পারি যে, এই সর্বানুভূতিই কবির জীবনের ও কাব্যের মূলসুর : অন্যান্য সমস্ত বৈচিত্র্য সৌন্দর্য, প্রেম, স্বদেশানুরাগ, সমস্ত সুখ-দুঃখ বেদনা এই মূলসুরের দ্বারা বৃহৎ বিশ্বব্যাপী একটি প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, 'সন্ধ্যাসংগীত' হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সকল কাব্যের মধ্যেই যেখানেই জীবন কোনো প্রবৃত্তির ভিতরে বাঁধা পড়িতেছে। সেখানেই আপনার অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া আপনার চেয়ে যাহা বড় তাহাকে পাইবার কান্না লাগিয়াই আছে, এই মূল সুরের মধ্যেই সেই ক্রন্দনের অর্থ নিহিত। এই সুরই বারম্বার রুদ্রতার গণ্ডি ছাড়াইয়া বিরাটের সঙ্গে তাঁহার জীবনকে যুক্ত করিয়াছে।

এইবার তাঁহার জীবনচরিত ও কাব্য উভয়কেই একত্রে মিলাইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের ভিতরের এই তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।" [৮]

লক্ষ্য করা দরকার অজিত চক্রবর্তী প্রাধান্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার উপর যা নাকি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মৌল প্রেরণা। অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চান জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যা কিছু ধারণা তার মূলে আছে এই আধ্যাত্মিকতাবোধ। অজিত চক্রবর্তীর এই ধারণার সঙ্গে একদিকে যেমন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল অন্যদিকে তেমনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের কিছু সমালোচকেরও দৃষ্টিভঙ্গীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 'The Philosophy of Rabindranath Tagore'গ্রন্থে ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছেন যে স্পিরিচুয়ালিজমই রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল প্রেরণা। ইউরোপের

---

৮. তদেব - পৃষ্ঠাসংখ্যা - ২২ - ২৩

বা পাশ্চাত্যদেশের পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথ একসময় মিস্টিক কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা মিস্টিক কবি হিসেবে অভিহিত করেছেন তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে অজিতচক্রবর্তী কিংবা রাধাকৃষ্ণনের মতো দৃষ্টিকোন থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন। হ এই ভাবে এঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বলতে এক বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক চেতনার কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এঁদের অভিমতের তুলনামূলক আলোচনা না করেও বলতে পারি যে এঁদের বক্তব্য নিঃসন্দেহে মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্টতই বলেছেন যে উপনিষদের আবহাওয়ায় গঠিত তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্যে তাঁর জীবন বিধৃত হয়েছে। প্রকারান্তরে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব তাঁর জীবন ও সৃষ্টিকে আপ্লুত করে আছে। এই দিক থেকে বিচার করলে এঁদের বক্তব্য সমীচিন বলেই মনে হবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা বিবেচনা করা দরকার। অজিত চক্রবর্তী যখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থটি লেখেন তখন রবীন্দ্রসাহিত্য প্রকৃতপক্ষে মাঝপথে। তাঁর মৃত্যুর (ইং - ১৯৪৮, বাংলা - ১৩২৫) পরেও রবীন্দ্রসাহিত্য অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ফলে রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিণতি তিনি দেখে যেতে পারেননি। সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আংশিক সত্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণন ও পাশ্চাত্যের পাঠকসমাজ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'স্পিরিচুয়ালিজম্ ও মিস্টিসিজম'র কথা বলেছেন তারও উৎস সন্ধান করা দরকার। এঁরা কবিকে জেনেছেন মূলতঃ ইংরেজী গীতাঞ্জলি এবং অন্যান্য কিছু ইংরেজী অনুবাদের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে এই যে এরা কখনোই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের সার্বিক পরিচয় পান নি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এঁদের ধারণার মূল উৎস যে ইংরেজী গীতাঞ্জলি একথা বোধহয় অস্বীকার করা যাবে না। ইংরেজী গীতাঞ্জলির মধ্যে

এমন অনেক রচনা আছে যেগুলি সরাসরি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এবং যেখানে, যাকে আমরা সাধারণতঃ মিস্টিক বলে থাকি, সেই পর্যায়ের অনেকগুলি লেখা সংকলিত হয়েছে। কিন্তু গীতাঞ্জলির সম্পর্কে এইটিই শেষ কথা নয় বা অন্যভাবে বলা যায় গীতাঞ্জলি একটি আধ্যাত্মিক কাব্য একথা বললে বক্তব্যের মধ্যে অনেকটা ফাঁক থেকে যায় কারণ বাংলা গীতাঞ্জলি তো বটেই ইংরেজী গীতাঞ্জলিতেও অনেক রচনা আছে যেগুলির উপাদান বিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রীতি। আসল কথা হলো অনেকে গীতাঞ্জলিকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বা প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা বলে ধরে নিয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যধারায় গীতাঞ্জলি নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ শীর্ষ। কিন্তু তার বেশি নয়। রাধাকৃষ্ণন বা পাশ্চাত্যের সমালোচকরা, যাঁরা শুধুমাত্র গীতাঞ্জলিকে রবীন্দ্রসৃষ্টির অভিজ্ঞান হিসেবে জেনেছেন এবং অন্যান্য রচনার পরিচয় পাননি, তাঁদের সম্পর্কেও একেই ভাবে বলা যায় যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে আংশিক সত্য হতে পারে কিন্তু সর্বৈব সত্য নয়।

অতঃপর, বিশিষ্ট রবীন্দ্রসমালোচক অধ্যাপক প্রমথ নাথ বিশীর বক্তব্য অনুধাবন যোগ্য :-

৪. "রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার প্রধান ধর্ম ইহার মানবমুখিতা, কালিদাসের পর এত বিরাট মানবমুখী কবি প্রতিভা আমাদের দেশে জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ।"

৫. "... রবীন্দ্র প্রতিভার পরিণাম কোথায় ? সিংহদ্বারে বসিয়া বাঁশি বাজানোকেই তিনি পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন কি অন্য কোন উপায়ে সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ? রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি মানুষের বিকল্প হইয়া

---

৪. রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ | প্রমথনাথ বিশী | মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স | বৈশাখ ১৩৯৬ | ভূমিকা অংশ |

৫. তদেব

দাঁড়াইয়াছে : ওয়ার্ডস ওয়ার্থ প্রকৃতির মধ্য দিয়া জগৎ সত্ত্বাকে জানিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানবসত্তাকে জানিয়াছেন; প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যে তিনি মানবপ্রীতির স্বাদ পাইয়াছেন। বাল্য ও কৈশোরের স্বাভাবিক প্রকৃতি-প্রীতি পরিণত বয়সে গভীর অর্থদ্যোতক হইয়া কবির জীবনে দেখা দিয়াছে।"

অধ্যাপক বিশীর বক্তব্যটি এখন পর্যালোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সূত্রত্র। অধ্যাপক বিশীর মতে মানবমুখিতাই রবীন্দ্রকাব্য প্রতিভার প্রধান ধর্ম। অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চান রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রেরণা, উঠে এসেছে মানুষের জীবন থেকে এবং তাঁর জীবনদর্শনও গড়ে উঠেছে এই মানব জীবনকে কেন্দ্র করে। তিনি বলেছেন যে কালিদাসের পর এমন মানব মুখি কবি আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেনি। অধ্যাপক বিশীর এই দৃষ্টিভঙ্গী গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখার বিষয়। সামগ্রিক ভাবে যদি আমরা কালিদাসের কাব্যসৃষ্টির কথা বিবেচনা করি তাহলে দেখবো কালিদাস যা কিছু লিখেছেন তা মানবজীবনেরই আলেখ্য। কালিদাসের নান্দনিক বোধ যেমন মানুষের সৌন্দর্য দিয়ে গড়া, তেমনি তাঁর যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাও মানুষের জীবনকে আশ্রয় করেই। অধ্যাপক বিশী কালিদাসের এই মানবমুখী কবি সত্ত্বার অনুরূপ প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রকারান্তরে তিনি বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূলে আছে মানবজীবন-প্রীতি।

তিনি অবশ্য এর সঙ্গে আর একটি মন্তব্য যোগ করেছেন। তাঁর প্রথম বক্তব্যের সূত্র ধরে রবীন্দ্র কাব্যের পরিণতি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষের বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকৃতি। অর্থাৎ অধ্যাপক বিশী মানব ও প্রকৃতিকে যুগ্মভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের উৎস বলে গণ্য করেছেন।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিশীর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অপর একটি অভিমত উল্লেখযোগ্য। তিনি 'রবীন্দ্রসরণী' গ্রন্থে একটি তত্ত্বকে সামনে রেখে রবীন্দ্রকাব্যের অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য বিচার করেছেন। অধ্যাপক বিশী জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্যকে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের অর্ন্তনিহিত সত্য হিসেবে গণ্য করে কিভাবে কবির সেই মন্তব্য তাঁর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে বিধৃত হয়েছে তা দেখিয়েছেন। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর সমগ্র কাব্যের একটি মাত্র পালা। এবং সে পালার নাম দেওয়া যেতে পারে সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যকে অধ্যাপক বিশী রবীন্দ্রকাব্য বিচারের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গণ্য করে কবির এই বক্তব্যটি তাঁর আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনুসরণে সীমা ও অসীম এই দুটি প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। সীমা বলতে বোঝায় জীবন ও প্রকৃতি। যার একটি বিশেষ রূপ আছে। এবং এই নিয়েই সীমার জগৎ রচিত। অন্যদিকে অসীমের জগৎ হচ্ছে এর বাইরের একটি জগৎ যাকে নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে ধরা যায় না। অর্থাৎ অরূপ। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই অরূপ হচ্ছে ঈশ্বরের সমার্থক। এবং অরূপের জগৎ হচ্ছে আধ্যাত্মিক জগৎ। তাহলে রবীন্দ্রনাথের অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে সীমা বা রূপের জগত বলতে তিনি অরূপের বা অসীমের আস্বাদ লাভ করেছেন। গীতাঞ্জলির অন্যতম গান হলো, সেই গান যার প্রথম কলি - "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" অবশ্য এই বোধ শেষপর্যন্ত আঁকড়ে ধরে থাকতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ কারণ গীতাঞ্জলির পরে রবীন্দ্র-কাব্যের যে পালাবদল হয় বলাকা থেকে, দেখা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত মানুষ ও প্রকৃতি যে পরিমাণ স্থান অধিকার করে আছে এই উত্তর পর্বের কাব্যধারায় সেই পরিমাণই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী আধ্যাত্মিক চেতনা স্থান পায় নি, একথা সত্যের খাতিরে মেনে নিতেই হয়। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই অধ্যাপক বিশী মানুষ ও প্রকৃতি অর্থাৎ সীমাকে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের ভিত্তিভূমি হিসেবে দেখিয়েছেন, যদিও তিনি অসীম বা অরূপ সত্ত্বাকে অগ্রাহ্য করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শণের ব্যাখ্যাটি পর্যবেক্ষন করতে গিয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল সেই সূত্র ধরে পুনরায় আমরা এই গবেষণা-কর্মের আলোচ্য বিষয় বা বক্তব্যের অবতারণা করছি। 'জীবনভাবনা' এই প্রত্যয়ের পিছনে আমাদের যে বক্তব্য নিহিত রয়েছে তার সঙ্গে অধ্যাপক বিশীর বক্তব্যের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তবে অধ্যাপক বিশী একভাবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন আমরা আর একভাবে সেই বিষয়টি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। অধ্যাপক বিশী বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত 'মানবমুখী' কবি। আমরা বলতে চাই তিনি জীবনশিল্পী বা জীবনমুখী কবি। এবং স্বভাবতই এই জীবন হচ্ছে রূপের জগৎ বা সীমার জগৎ। যা আমরা চোখে দেখি বা ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। স্বাভাবিক কারণেই আমাদের মনে হয়েছে যে নিজের কাব্য সম্পর্কে কবির মন্তব্য সর্বতোভাবে সত্য এবং তাঁর কাব্যবিচারে যথার্থ অভিজ্ঞান। সেই কারণেই আমাদের একথাও মনে হয়েছে যে যা আমরা রবীন্দ্রকাব্য হিসেবে দেখছি আসলে তা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবনভাবনার প্রকাশ। স্বভাবতই এই বিচিত্র জীবনের বিচিত্র দিক আছে। তার ভিতর থেকে আমরা কয়েকটি দিক নির্বাচিত করে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার একটি রূপরেখা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি মাত্র। আগেই বলেছি যে এই দিকগুলি রবীন্দ্র নাথের জীবনভাবনার মৌলিক উপাদান। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে তাদের প্রত্যেকটির অস্তিত্ব জীবনসাহিত্যে কীভাবে রয়ে গেছে তা দেখানো হয়েছে। সেইসব কথা স্মরণ রেখে অবশেষে রবীন্দ্রনাথের এই জীবনভাবনা কি রূপ নিয়েছে সেই কথাটিই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

এই জীবনভাবনার কথা বলতে গিয়ে পুনরায় আমরা তাঁর নিজের মন্তব্য স্মরণ করছি যেখানে তিনি বলেছেন যে তাঁর সমস্ত কাব্যের একটি মাত্র পালা এবং সেই পালার অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধন করা। আমরা এই মন্তব্যকে সামনে রেখে যদি রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো -

বস্তুত, গীতাঞ্জলির মধ্যেই কবি তাঁর কাব্যরচনার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন : "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" অর্থাৎ যে অন্বিষ্ট নিয়ে কবি কাব্য রচনা করেছেন, তার চরিতার্থতা ঘটেছে ১৯১০ সালে রচিত গীতাঞ্জলির মধ্যেই। কবির জীবনভাবনার একটি স্তর এইভাবেই শেষ হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, যদি কবির জীবনদর্শন বা জীবনভাবনার এইভাবে চরিতার্থতা ঘটে থাকে, তাহলে পরবর্তী কাব্যের সার্থকতা কোথায় ? অর্থাৎ সরাসরি বলা যায় - গীতাঞ্জলির মধ্যেই যদি কবির কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সফল হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী কাব্যধারার কী প্রয়োজন ছিল ? বাহ্যত একথার উত্তর দেওয়া কঠিন, কারণ, আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি - যে সীমা-অসীমের মিলনের কথা কবি স্বয়ং বলেছেন তা অনিবার্য ভাবেই সিদ্ধ হয়েছে গীতাঞ্জলির মধ্যে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, গীতাঞ্জলি-পরবর্তী কাব্য-ধারায় কবি অন্য দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবনভাবনা সামনে রেখে এগিয়ে গেছেন, এবং ভিন্নতর অন্বিষ্ট সামনে রেখেছেন।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বা এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই - গীতাঞ্জলি পরবর্তী কাব্যধারায় কবি যেন আস্তে আস্তে তাঁর পূর্ববর্তী জীবন ভাবনা থেকে সরে গেছেন। জন্মলগ্ন থেকে যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ কবির জীবনকে আচ্ছন্ন করেছিল, যে উপনিষদের জীবনদর্শন তাঁর জীবনের মর্মমূলে বাসা বেঁধে ছিল - দেখা যাচ্ছে - 'বলাকা' থেকে কবির সেই আধ্যাত্মিক চেতনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এবং তার জায়গায় ক্রমশঃ স্থান নিয়েছে মানব জীবন এবং মানব জীবনের নানান সমস্যা। বিশেষভাবে যদি 'বলাকার' দিকে আমরা তাকাই, তাহলে দেখবো - বস্তুত, এখান থেকেই সরাসরি কবি যেন বাস্তব জীবনের কঠোরতা ও তার অন্ধকার দিকগুলির

প্রতি অবহিত হয়েছেন। 'পরিশেষ' কাব্যের 'প্রশ্ন' কবিতার মধ্যে যে প্রশ্ন তা আসলে এইটেই প্রমাণ করে - কবি আর আগের মতন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যময় রোমান্টিক জগতের বাসিন্দা আর নন, তিনি নেমে এসেছেন বাস্তব মর্ত্যলোকে, এবং পাপ-অন্ধকার-অমঙ্গলবোধ পরিবৃত এই যে মানুষের জীবন, সেই জীবনের প্রতি কবি যেন গভীরভাবে মগ্ন হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে - 'বলাকা' উত্তর রবীন্দ্রকাব্যের মুখ্য উপাদান মানবজীবন, আগেকার আধ্যাত্মিক জীবনবোধ এখানে, এই পর্বে, প্রায় ক্ষীণ হয়ে এসেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এবং এও লক্ষ্য করা যায়, কবি মানবজীবনের অবহেলিত তুচ্ছাতিতুচ্ছ সুখ-দুঃখের প্রতি আগের মতো আর অমনোযোগী নন, বরং বেশি ক'রে এইসব সামান্য আপাত অসুন্দর বস্তুর প্রতি তিনি উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হয়েছেন, হ'তে হ'তে অবশেষে 'জন্মদিনে' কাব্য-গ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতায়, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গভীরভাবে আক্ষেপ করে বললেন -

"মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গনের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।"

এবং ঘোষণা করলেন -

"যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

- এইভাবেই কবি একদিকে যেমন তাঁর কাব্যের অপূর্ণতার কথা ঘোষণা করেছেন অন্যদিকে একদা দূর থেকে যে জীবনকে বা যাকে সত্য বলে মনে করেছিলেন, তা এখন তাঁর কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে না। কারণ কবি বুঝতে পেরেছেন কাল্পনিক সুন্দর ও আধ্যাত্মিক জগতের চেয়ে চোখে - দেখা মানুষের জীবন অনেক বেশি সত্য। বস্তুত, সম্ভবত এই কারণেই আমরা দেখতে পেলাম - প্রাক্ - 'বলাকা' জীবনভাবনার সঙ্গে 'বলাকা' পরবর্তী জীবন ভাবনার গভীর পার্থক্য ঘটে গেছে। আগের পর্বের প্রেরণা যদি হয় অরূপানুভূতি বা আধ্যাত্মিক চেতনা, তাহলে বলাকা পরবর্তী কাব্যের প্রেরণা নিঃসন্দেহে মানবজীবন।

যে কবি একদা অসীমের বা অরূপের জন্যে মনে মনে ব্যাকুলতা বোধ করেছেন, সেই কবি ফিরে এলেন মানুষের জীবনে অর্থাৎ সীমার জগতে। তাই দেখি, শেষ পর্বের কাব্য ধারায় কবি বারংবার ধরণীর ও মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার এই উত্তরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো।

কিন্তু, এই যে মানবজীবনের কথা বলেছি (অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীও বলেছেন রবীন্দ্রনাথ মূলত মানবমুখী কবি, সম্ভবত, তিনি এই পরিণতির কথা মনে রেখেই কথাটা বলেছেন), সেই মানবজীবন কি শুধু মানুষের 'সুখদুঃখ বিরহ মিলনপূর্ণ' জীবন-আলেখ্য ? যদি তাই বলা হয়, তাহলে কথাটা অতি - সরলীকরণের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে। আসলে তা নয়। এখানে যে মানবজীবনমুখিতার কথা বলছি, তা মানুষেরই জীবনের প্রতি আগ্রহ, সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে - মানুষের জীবনেও তো আছে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা। অসীম বা অরূপও রহস্যে ঢাকা। মানুষের জীবনও অন্যভাবে রহস্যময়। বস্তুত, আমরা দেখতে পাচ্ছি - অন্তত 'প্রান্তিক' এ পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত মানব-জীবনের গভীরে আরো এক সত্যকে ধরতে চেষ্টা করছেন, চোখে দেখা যায় না এমন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। একদিকে তিনি বারংবার মানুষের জীবনকে তাঁর কাব্যের মূল উপজীব্য করে তুলছেন, অন্যদিকে তার পাশে তিনি মনে মনে এই অজ্ঞাত রহস্যময়তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন। 'প্রান্তিক' পরবর্তী 'আরোগ্য', 'রোগশয্যায়', 'সেঁজুতি', প্রভৃতি শেষ প্রান্তের কাব্যধারায় এমনি এক কবি-মনকে মনে মনে অনুভব করতে পারি এবং তখন মনে হয় - যে কবি একদা সীমার মধ্যে অসীমকে মেলাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন, সেই কবি কোথায় ? তখন মনে হয় যে স্থির বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে কবি একদা আত্মনিবেদন করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে, সেই উপলব্ধি, সেই বিশ্বাস কোথায় গেল ? একথা মনে হবেই রবীন্দ্র-কাব্যের

শেষপ্রান্তে পৌঁছে, কারণ বারংবার জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে, জেগেছে সংশয়, দ্বন্দ্ব। আগেকার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে তিনি আগের জীবনভাবনার মধ্যে নিজেকে আর ব্যাপৃত রাখেন নি। তার বদলে একটা চরম বিশ্বাসহীনতা, ব্যর্থতাবোধ ফুটে উঠেছে নানাভাবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা তথা জীবনদর্শনের পরিণতি হচ্ছে এই, তিনি বুঝতে পেরেছেন - আসলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতো মানুষের জীবনও দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ঢাকা। তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে যাওয়া বৃথা, কারণ তার স্বরূপই জানবার কোনো পথ নেই, কারণ সেই রহস্য উন্মোচনের কোনো পথ নেই - শুধু দেখতে হয়, দেখে যেতে হয় এবং জীবন যেমন তেমনিই, তাকে মেনে নিতে হয়, মেনে নিয়েই বাঁচতে হয়। এই হচ্ছে চরম ও পরম সত্য।

এবং একথারই বাণীরূপটি দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবিতায়, যেখানে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কবি বলছেন -

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত,
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরসত্য,

সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

(শেষ লেখা, ১৫ নং কবিতা)

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
৩০ শে জুলাই ১৯৪১। সকাল সাড়ে নয়টা

এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার পরিণতি। উপনিষদের প্রাচীন ঋষিরা প্রশ্ন করেছিলেন সূর্যের দিকে তাকিয়ে -

"হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতম্ মুখম্, পূষন্নপাবৃনু, সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে।" সহস্র বছর ধরে দার্শনিক কবি এই প্রশ্ন করে এসেছেন নানাভাবে, নানারূপে। তাঁরা সকলেই সত্যকে দেখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও চেয়েছেন সেই একই সত্যকে উপলব্ধি করতে। উপনিষদের ঋষিরা তাঁদের সেই প্রশ্নের জিজ্ঞাসার উত্তর পান নি। রবীন্দ্রনাথও

পেলেন না। সম্ভবত কেউই পায় না। কারণ, সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোন পথ খোলা নেই। তাই আমরা প্রশ্ন করতে পারি, সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হতে পারি, তার জন্যে সাধনাও করতে পারি - কিন্তু সেই রহস্যের উদঘাটন কেউ করতে পারে না। শুধু ব্যাকুলতার সঙ্গে সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি - "হে পূষণ, হে সূর্যদেব, রহস্যের ঢাকনা খুলে দাও।" সূর্যদেব সত্যের ঢাকনা খুলে দেন নি আজো।

তাই, যে জিজ্ঞাসা যে প্রশ্ন নিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ যাত্রা করেছিলেন, যে প্রশ্ন শেলীর মনেও জেগেছিল - সেই প্রশ্নের কোনো সমাধান, কোনো উত্তর রবীন্দ্রনাথও দিতে পারেন নি, বার বার তিনি সত্যের কথা বলেছেন, সত্যোপলব্ধির কথা বলেছেন, কিন্তু সেই সত্যে পৌঁছোতে পারেন নি। পারেন নি কারণ পারা সম্ভব নয়। তিনি আসলে অন্যান্য দার্শনিকের মতোই একজন দর্শক - কবি বা "poet-seer" এবং রবীন্দ্রকাব্য তথা রবীন্দ্রসাহিত্য আসলে সেই "Poet-seer" এর দেখা বিভিন্ন ভাবনার বাণীরূপ।

এখানেই রবীন্দ্রকাব্যের মূল তাৎপর্য, "রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা" প্রত্যয়ের সার্থকতা।

———— o ————

উল্লেখপঞ্জী

১. অজিত চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ

২. প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ

৩. Ramananda Chatterjee ed./ The Golden Book of Tagore/ Rammohon Library and Free Reading Room; Calcutta 1990.

৪. S. Radhakrishnan /The philosophy of Rabindranath Tagore.

৫. সত্যেন্দ্রনাথ রায় / রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ